বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৪ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৩

বাংলাদেশের বিগত খাদ্য ও কৃষি নীতির পর্যালোচনা

কাজী সাহাবউদ্দিন*

১। পটভূমি

বিগত সময়ে অনুসৃত খাদ্য ও কৃষি নীতিতে যে সংস্কার সাধিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। ১৯৬০ সালের কৃষি কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে কৃষিতে উৎপাদনের আধুনিক উপকরণ প্রচলনের সরকারি প্রচেষ্টার সুত্রপাত হয়। একই কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (ইপিএডিসি) নামক আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। কৃষি উপকরণ (যেমন: সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক দ্রব্য) সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্ব ইপিএডিসিকে প্রদান করা হয়। ইপিএডিসি স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণ বিতরণের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইপিএডিসি-এর নামকরণ করা হয় বিএডিসি অর্থাৎ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। কৃষি উপকরণ বাজারে ইপিএডিসি একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করলেও সরকার প্রণীত বাজার মূল্য ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করত।

২। প্রাক-উদারনীতিকরণ সময় (Pre-liberalization Period)

বিএডিসি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কৃষকরা উল্লেখযোগ্য হারে রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু করে। ১৯৭৭-৭৮ সালে বিএডিসি ৭.২৫ লাখ মেট্রিক টন সার বিক্রয় করে, যার বেশির ভাগই ছিল ইউরিয়া। এ সার ট্রানজিট গুদাম, মধ্যবর্তী গুদাম ও থানা বিক্রয় কেন্দ্রে (TSC) পরিবহন করা হতো। থানা বিক্রয় কেন্দ্র পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত; কেননা টিএসসি যেমন কৃষকের নিকট সরাসরি বিক্রয় করত তেমনি ডিলারদের নিকটও বিক্রয় করত যাতে ডিলাররা আবার কৃষকের নিকট খুচরা দরে বিক্রি করতে পারে। ডিলাররা অবশ্য নির্ধারিত এলাকার বাইরে বিক্রি করতে পারত না। নির্ধারিত থানা বিক্রয়কেন্দ্র থেকে সার সংগ্রহ করে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করত। তবে থানা বিক্রয় কেন্দ্র ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাঝে দূরত্বের ভিত্তিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যের উপর কমিশনের ব্যবস্থা ছিল। কমিশন বাদে সারা দেশে সারের দাম থাকত অভিন্ন। এ ব্যবস্থা মাত্রাতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কারণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় (Ahmed 1999)।

সেচ সুবিধার বিকাশ ও সেচপানি বিপণন পদ্ধতি তিনটি পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে:আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি মালিকানা, সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি মালিকানা এবং বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিযোগিতামূলক সেচপানি বাজার (water markets) (Osmani and Quasem, 1990)। ১৯৫০ এর দশকের শেষ দিকে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সূচনা কালে সরকার ব্যাপকহারে ভূ-উপরিস্থ পানি ভিত্তিক বৃহদায়তন সেচ প্রকল্পের ওপর গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু এই প্রকল্পগুলোকে বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ক্ষেপন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ

* সাবেক মহাপরিচালক, বিআইডিএস।

ব্যবস্থাপনাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সময়ের পরিক্রমায় সরকার ক্ষুদ্রায়তন সেচ প্রকল্পের প্রতি নজর দেয় যেমন ভূ-উপরিস্থ পানি উঠানোর ক্ষেত্রে পাওয়ার পাম্প (LLP) এবং ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে টিউবওয়েল ব্যবহার।

১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত বিএডিসি ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB) এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হতো। এক্ষেত্রে বিএডিসি সকল ধরনের সেচ সরঞ্জামাদি এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আগ্রহী কৃষকদের কাছে অগভীর নলকূপ বিক্রয় করত। ষাটের দশকে সেচ পাম্প সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গভীর নলকূপ স্থাপনে বিএডিসির ছিল একক আধিপত্য। বিএডিসি নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে সেচ সমবায়ীদেরকে সেচযন্ত্র মৌসুম ভিত্তিক ভাড়া দিত। সত্তরের দশকে কৃষক সমবায় সমিতিগুলো সেচযন্ত্রপাতির পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লাভ করে। এই ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক বিএডিসি মালিকানাধীন সেচ যন্ত্রপাতি পর্যায়ক্রমে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত অথাৎ ১৯৭৮/৭৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।[১]

দেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্রায়তনের ও বিক্ষিপ্ত জমিতে (small and scattered holdings) সেচ প্রদানে অগভীর নলকূপ কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে অনুধাবনের কারণে সরকার আশির দশকের গোড়ার দিকে বেসরকারি খাতকে অগভীর নলকূপ (STW) আমদানি ও ব্যবসার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু আমদানিকারকদেরকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মান নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন শর্তাদি মেনে চলতে হতো যেমন: নির্দিষ্ট ব্র্যাণ্ড ও মডেল ক্রয়, দুটি গভীর নলকূপের মাঝে ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রাখা এবং অগভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য উপযোগী ভৌগোলিক এলাকা বিবেচনা করা। কাঠামোগত সমন্বয় নীতির (structural adjustment policies) আওতায় বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি বাস্তবায়নের ফলে সরকার ১৯৮৬ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রদানের ভিত্তিতে যেকোনো ব্র্যাণ্ড ও মডেলের ডিজেল ইঞ্জিন আমদানির অনুমতি প্রদান করে। ১৯৮৮ সালে UNDP-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষি খাত বিষয়ক সমীক্ষার (Agriculture Sector Study) সুপারিশ অনুসারে সরকার ডিজেল ইঞ্জিন আমদানিতে আরোপিত শুল্ক ও মান নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তাদি প্রত্যাহার করে সরকারের অনুমতি ছাড়া কৃষি সরঞ্জামাদি আমদানির সুযোগ প্রদান করে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে আমদানি শুল্ক পুনরায় আরোপ করা হলেও শুল্ক হার আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের তুলনায় অনেক কম ছিল।

বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যবস্থায় কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য বীজ উৎপাদন করে থাকে। তবে যাদের বীজের প্রয়োজন তারা বাজার থেকে ক্রয় করে থাকে। অবশ্য বীজ উৎপাদনে অনেকের বিশেষ পারদর্শিতা রয়েছে। এ বীজ সরবরাহ ব্যবস্থা কেবল দেশীয় কৃষকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাংলাদেশ ও ভারতের কৃষকদের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

---

[১] সেচ যন্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দাম নির্ধারণ করতে পারে-এই আশংকায় প্রাথমিকভাবে সমবায়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ক্রয় ক্ষেত্রে তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা এবং ভর্তুকি মূল্যে ক্রয় সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সমবায়ীদেরকে দেয়া এসব অগ্রাধিকারমূলক সুবিধাসমূহ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ১৯৮৩ সালের মধ্যে বিএডিসি মালিকানার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ লো-লিফ্ট পাম্প ও গভীর নলকূপ (DTWs) বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়।

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রে উদ্ভাবিত উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের অন্য চ্যানেলটি হলো সরকারি সংস্থা। বিভিন্ন ফসলের উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য বিএডিসি প্রায় ১২টি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে। বীজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে সরকার বীজ প্রত্যয়ন ব্যবস্থা (seed certification mechanism) চালু করলেও নিম্নমান ও সময়মত সরবরাহের অপ্রতুলতার কারণে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। অতীতে বিএডিসি উচ্চ ফলনশীল ফসলের বীজ আমদানি করেছে; যেমন: আলুর উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে হল্যাণ্ড থেকে আলু বীজ এবং গমের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মেক্সিকো থেকে গম বীজ আমদানি করে। মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বীজ বাণিজ্য প্রবর্তনে বাজার ব্যবস্থার উদারীকরণ হতে পারে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে এক কার্যকর পদ্ধতি।

৩। কৃষি উপকরণ বাজার ব্যবস্থার সংস্কার (Reform in Input Markets)

সার ও সেচ যন্ত্রপাতির বাজার উদারীকরণ ছিল সংস্কারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সারের বাজারে বেসরকারি বাণিজ্যের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ১৯৮৮ সালে ৮,০০০ পাইকারি বিক্রেতা ও ৫০,০০০ খুচরা বিক্রেতা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে সারের বাজারে সক্রিয় ছিল। তথাপি সার আমদানির ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে ব্যবসায়ীদের প্রভেদমূলক অভিগম্যতা পরিণামে আমদানি বাণিজ্যকে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ (oligopolistic) করে ফেলার সংশয় থেকেই যায়। কৃষি উপকরণ বাজার ব্যবস্থার সংস্কারসমূহের ক্রমবিকাশ সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে। ১৯৯৫ সালের সার সংকটের সাথে যুক্ত নীতি পরিবর্তন (policy reversal), বিশেষ করে বাংলাদেশের সার বাজারের ক্ষেত্রে নীতি সংস্কার যাচাই করা যুক্তিযুক্ত। ১৯৯৫ সালের সার সংকট সন্দেহাতীতভাবে সরকারের বাজার হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা নির্দেশ করলেও সরকারি বাজারজাতকরণের পুরনো মডেলে ফিরে যাবার কথা বলে না। যৌক্তিকভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, কেন প্রতিযোগিতামূলক সারের বাজার মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে হঠাৎ করে ব্যর্থ হলো যা বরাবরই ভালো করে আসছিল। দেখা গেছে, খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা বিরাজ করলেও ফ্যাক্টরি গেটের সরবরাহ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (oligopolistic) বাজার কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাজারের শীর্ষ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা বজায় না থাকলে যেকোনো ধরনের অসঙ্গতি পুরো বাজার ব্যবস্থায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

অন্যদিকে চাহিদার তারতম্য, উৎপাদন ক্ষেত্রে economies of scale, সার কারখানা বিকাশের ঐতিহাসিক কারণ ইত্যাদির জন্য শীর্ষ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা বজায় রাখা কঠিন। এ সমস্যার সমাধান করা যায়: (১) ব্যবস্থাপনা তদারক পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে (management monitoring system) যা পূর্বেই সমস্যাসমূহ সনাক্ত করতে পারে যাতে করে নীতি নির্ধারকগণ প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং (২) ফ্যাক্টরি গেট থেকে সার সরবরাহ ও মূল্য নির্ধারণ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা (regulatory mechanism) চালুর মাধ্যমে (Ahmed 1995)।

অধিকন্তু সরকার কর্তৃক বাজার নিয়ন্ত্রণ, যেমন সার সংকটের সময় সার বিতরণে জেলা প্রশাসকদেরকে ক্ষমতা প্রদান ছিল একটি উৎপাদনবিমুখ (counter productive) প্রচেষ্টা। দেশে উৎপাদিত সারের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া সাধারণত সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় থেকে ফসফেট ও পটাশজাত সারের ব্যবহার নাইট্রোজেন জাত সারের (ইউরিয়া)

তুলনায় কমতে শুরু করে। যেহেতু দীর্ঘমেয়াদে মাটির গুনাগুণ রক্ষায় ফসফেট ও পটাশজাত সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেহেতু ইউরিয়া সারের তুলনায় তাদের দাম কম নির্ধারণ করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে সার সরবরাহ ও বিপণনে সরকারি হস্তক্ষেপের শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝিতে বিশেষ করে ১৯৯৫ সালের সার সংকটের কারণে। বাংলাদেশে সার সংকটের ঘটনা বিশেষ করে উচ্চ চাহিদার সময়ে সংকট অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়,তবে বিশদ গবেষণার অভাবে এ ধরনের সংকটের পিছনে কি কারণ রয়েছে তা স্পষ্ট নয়।[২] উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৫ সালের সার সংকটের জন্য সরকার যেখানে market imperfection-কে দায়ী করে, সেখানে পাইকারি বিক্রেতা ও অন্যরা অতিরিক্ত সরকারি হস্তক্ষেপকেই এ সংকটের জন্য দায়ী বলে মনে করে।[৩]

সার সংকট সৃষ্টির জন্য নানাবিধ কারণের কথা বলা যেতে পারে। যেমন, অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ বা অন্য কোনো কারিগরি অসুবিধার জন্য দেশীয় সার উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সার আমদানির ঘাটতি বা বিলম্ব, অরক্ষিত সীমান্তপথে দেশের বাইরে সারের চোরাচালান, অতি মুনাফা লাভের জন্য সার ব্যবসায়ীদের অসৎ উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য কারণ সমূহ। ২০০৮ সালের সার সংকটের অন্যতম কারণ ছিল ইউরিয়া সারের অপর্যাপ্ততা এবং নন-ইউরিয়া সারের উচ্চ মূল্য। উল্লেখ্য যে, সার বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা নির্বিশেষে সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এবং শিথিল হস্তক্ষেপ উভয় সময়েই সার সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এটা সার সরবরাহ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দুর্বলতা নির্দেশ করে, আর এজন্য দরকার বিশদ গবেষণা ও বিশ্লেষণ এবং যথাযথ সরকারি নীতিগত হস্তক্ষেপ (Mujeri *et al.* 2014)।

বলা হয়ে থাকে যে, সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও হস্তক্ষেপ প্রায়শ সার বাজারে অসঙ্গতি (distortions) তৈরি করে। যেসব আইন কানুন, বিধিবিধান রয়েছে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে কোন কোন সার বিক্রয় ও বাজারজাত করা যাবে তা নির্ধারণ করে দেয়, উপজেলা পর্যায়ে সারের অবাধ প্রবাহে এবং বেসরকারি খাতের যথাযথ ভূমিকা পালনে বিঘ্ন সৃষ্টির পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের সেবা প্রদান ব্যাহত করে। অধিকন্তু সারের চাহিদা নিরূপণ করা হয় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যা চাহিদা ভিত্তিক নয়। ইউরিয়া সার আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিক) একচেটিয়া প্রভাব বিস্তর করে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যত কোনো ভূমিকা নেই। বিএডিসি এবং বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি আমদানি করে থাকে। এর ফলে সার আমদানির ক্ষেত্রে কোনো সমন্বয় না থাকায় সার মজুদে উদ্বৃত্ত মজুদ বা ঘাটতি দেখা দেয়।

সংস্কারের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল সেচ ব্যবস্থার উপর। ১৯৮৯ সালের প্রথম দিকে ৪-৫ হেক্টর জমিতে সেচের উপযোগী পাম্প ও ইঞ্জিনসমেত একটি পূর্ণাঙ্গ অগভীর নলকূপের দাম পড়ত ২০,০০০ টাকা বা ৬০০ মার্কিন ডলার, যা ছিল বিএডিসি প্রদত্ত ভর্তুকি সহ নির্ধারিত মূল্যের ৬০

---

[২]উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৮৪ ও ২০০৮ সালে বড় রকমের সার সংকট দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু, স্থানীয় পর্যায়ের সার সংকট একটি নিয়মিত ব্যাপার।

[৩]বণ্টন প্রক্রিয়ার রাজনীতিকীকরণের ফলে বেশিরভাগ বাজারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় বলে প্রতীয়মান হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার ভাষ্যমতে "অভিজ্ঞ পুরনো ব্যবসায়ীদের বাদ দেয়া হয়। এর স্থলে রাজনৈতিক বিবেচনায় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের হাতে এই ব্যবসা তুলে দেয়া হয় (*The Daily Star*, March 13, 1995)।

শতাংশের সমান। এর ফলে ১৯৮৮-৯০ সময়কালে সেচকৃত বা সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ১৯৭৮-৮৬ সময়কালের সেচকৃত জমির প্রায় দ্বিগুণ হয়। সেচকাজে পাওয়ার টিলারের ব্যবহার কম হলেও আমদানি উদারীকরণের ফলে এর দাম ২,৫০০ মার্কিন ডলার থেকে কমে ১৯৮৯ সালে ১,৫০০ মার্কিন ডলার হয় (Guiselquist 1992)। অবশ্য আমদানি পর্যায়ে বিরাজমান বাধাসমূহ দূরীভূত হওয়ায় পাওয়ার টিলারের ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। বীজ ও কীটনাশক দ্রব্যের বাজার উদারীকরণের প্রভাব স্বল্প মেয়াদে কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে, বিশেষ করে বীজের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে (Ahmed 1999)।

সারণি ১

কৃষি উপকরণ বাজার ব্যবস্থার উদারীকরণের পর্যায়ক্রম

কার্যক্রম	সময়কাল	মন্তব্য
সার বাজার ব্যবস্থা		
বিএডিসি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পাইকারি ও খুচরা বাজারসমূহ (প্রাথমিক বিক্রয় কেন্দ্র) থেকে সরে আসে	১৯৭৮-৮৩	চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়।
লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা ও যাতায়াতের উপর বিধি নিষেধের (ভারতের সাথে ৫ মাইল সীমান্ত অঞ্চল বাদে) অপসারণ	১৯৮২-৮৩	”
সারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপসারণ	১৯৮২-৮৪	সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সূচনা
বেসরকারি ব্যবসায়ীদেরকে ফ্যাক্টরি গেট ও বন্দর থেকে সরাসরি সার ক্রয়ের অনুমতি প্রদান	১৯৮৯	ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়
বিশ্ব বাজার থেকে অবাধ আমদানি	১৯৯২	ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু একচেটিয়া বাজার ব্যবস্থা বিরাজ করার আশংকা
সেচ যন্ত্রপাতি		
বিশেষ ঋণ সুবিধার কারণে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের বিএডিসি হতে লো-লিফট পাম্প ক্রয়।	১৯৮০-৮২	কৃষকদের নিকট থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যায়।
বিএডিসি এর সকল নলকূপ কৃষক ও সমবায়ী সমিতির কাছে বিক্রয়; ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।	১৯৮৩-৮৫	কৃষকদের কাছে থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

(চলমান সারণি ১)

কার্যক্রম	সময়কাল	মন্তব্য
ইঞ্জিন ও পাম্প আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা অপসারণ	১৯৮৮	ইঞ্জিনের দামের ব্যাপক হ্রাস
নির্দিষ্ট ব্র্যাণ্ড ও মডেলের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ অপসারণ	১৯৮৮	ইঞ্জিনের দামের ব্যাপক হ্রাস
পাওয়ার টিলার, কীটনাশক ও বীজ		
পাওয়ার টিলার আমদানি ও এক্ষেত্রে মাননিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ অপসারণ	১৯৮৯	মাঝারি ধরনের সাড়া
বালাইনাশক আমদানির ক্ষেত্রে ব্র্যাণ্ড নাম জনিত বিধির শিথিল করণ	১৯৮৯	পরিমিত সাড়া
ধান ও গম ব্যতিত অন্য সকল বীজ আমদানি উদারীকরণ	১৯৯০	পরিমিত সাড়া

উৎস: Ahmed (1999)।

৪। উদারীকরণের প্রভাব

উদারীকরণের দু'ধরনের প্রভাব রয়েছে: (ক) উপকরণের ব্যবহারের মাত্রাগত পরিবর্তনের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং (খ) ভর্তুকি হ্রাস অথবা প্রত্যাহারের কারণে বাজেট বরাদ্দ পুনর্বিন্যাসের ফলে কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদনের উপর পরোক্ষ প্রভাব। কৃষি ক্ষেত্রে উদারীকরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও উপকরণের উপর ভর্তুকি হ্রাসের প্রভাব সম্পর্কেও নিম্নে আলোচনা করা হবে।

সারের উপর ভর্তুকির পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল ১,২৮৬ মিলিয়ন টাকা (৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ১৯৮৩/৮৪ সালে ১,৪২৬ মিলিয়ন টাকা (৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ১৯৮৮/৮৯ সালে ১,২৭৩ মিলিয়ন টাকা (৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ১৯৯২/৯৩ সালে মাত্র ২৫ মিলিয়ন টাকা (০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ১৯৮৩/৮৪ সালে সারের ভর্তুকির পরিমাণ ছিল কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত মোট বরাদ্দের প্রায় ১৪ শতাংশ, যা ১৯৭৯/৮০ সালে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত মোট বরাদ্দের ২৮ শতাংশ। সুতরাং সার বাজার উদারীকরণের ফলে বাজেটে ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস ছিল উল্লেখযোগ্য। সেচ ক্ষেত্রে এ ধরনের ভর্তুকির কোনো তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়নি। বিএডিসির লো-লিফট পাম্প ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচিতে ১৯৭৯/৮০ ও ১৯৮৩/৮৪ সালে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০৩৫ মিলিয়ন টাকা (৬৬.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও ৮৩০ মিলিয়ন টাকা (৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ১৯৮৬ সালের বিএডিসির লো-লিফ্ট পাম্প ও নলকূপের উপর থেকে আরোপিত ভর্তুকি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়।

বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার সংস্কারের প্রভাব সংক্রান্ত বাস্তবভিত্তিক গবেষণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আহমেদ (১৯৯৫) ধান উৎপাদনের উপর কৃষি উপকরণের বাজার সংস্কারের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। বহু-সমীকরণ ভিত্তিক মডেল (multi-equation model) ব্যবহার করে তিনি উপকরণের বাজার উদারীকরণের প্রত্যক্ষ প্রভাব নিরূপণ করেছেন যেখানে একটি প্রতিরূপক চলক (dummy variable) এর মাধ্যমে প্রাক-উদারীকরণ ও উদারীকরণ পার্থক্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণাটি থেকে দেখা গেছে যে, ১৯৮৪-৯২ সময়কালে ধান উৎপাদনে সফলতার মূল কারণ ছিল সার ও সেচ বাজার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ধানের উৎপাদন ২০ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে মূলত সার ব্যবহার এবং বেসরকারি পর্যায়ে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। আহমেদ আরও বলেন, বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদনের উপকরণের বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ নীতির পরিবর্তন না হলে খাদ্যশস্যের স্বল্পতা ও খাদ্যের উচ্চ মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি পেত।

উদারীকরণ প্রভাবের যথাযথ পরিমাণ নির্ণয়ের চেয়ে গতিবিধি নিরূপণ করাই ছিল উপরোক্ত আলোচনার মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন কৃষি নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে প্রনিধাণযোগ্য: (ক) কৃষি ক্ষেত্রে প্রবর্তিত বাজার সংস্কার ব্যবস্থা টেকসই করতে এবং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে আর কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে? কৃষি বাজারে সরকারের ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ? (খ) কৃষির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বাজার সংস্কার কী যথেষ্ট? যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? যেকোনো মূল্যেই কি কৃষির উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে? (গ) যদি সব সংস্কার সম্পন্ন হয় এবং কৃষি বাজার প্রতিযোগিতামূলকভাবে চালু থাকে, তাহলে বার্ষিক ৩ থেকে ৪ শতাংশ হারে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে কী তা যথেষ্ট হবে? কেবল বাজার সংস্কার ৪ শতাংশ হারে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি বৃহৎ ও টেকসই যোগান প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে মৌলিক কাঠামোগত উপাদানের (basic structural factors) উপর যা কৃষি উৎপাদনকারীরা বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না।

৫। অতীত খাদ্য নীতির মূল্যায়ন

প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদানে ১৯৭০ দশকের শেষ দিকে সরকার ধান ও গমের ক্ষেত্রে মূল্য সহায়তা (price support) নীতি গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সরকারি সরবরাহ প্রক্রিয়া (Public Food Distribution System-PFDS) চালু রাখা। এক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষ্য ছিল চালের মূল্য স্থিতিশীল রাখা। সরকার বিভিন্ন নগদীকৃত (monetized) চ্যানেলের মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করতে থাকে যেমন শহুরে ভোক্তাদের জন্য সংবিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা, গ্রামীণ ভোক্তাদের জন্য সংশোধিত (modified) রেশন ব্যবস্থা, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীসমূহ যেমন প্রতিরক্ষা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারি খাতভুক্ত কর্মচারীদের জন্য রেশন ব্যবস্থা।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর খাদ্য সহায়তাপুষ্ট ব্যাপক গণপূর্ত কর্মসূচির মাধ্যমে অনগদীকৃত (non-monetized) চ্যানেলে খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' (কাবিখা) অদ্যাবধি চালু আছে। এ কর্মসূচির দুটি উদ্দেশ্য হলো: (ক) কৃষি কাজে যখন মন্দাবস্থা

বিরাজ করে (slack season) তখন ভূমিহীন কৃষকদের ত্রাণ প্রদান করা এবং (খ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ১৯৮০ সালে আরেকটি অনগদীকৃত খাদ্য সরবরাহ চ্যানেলে 'দু:স্থদের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি' (Vulnerable Group Feeding-VGF) চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় নি:স্ব ও অসহায় মহিলা ও মহিলা-প্রধান পরিবারকে মাসিক খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। এ কর্মসূচি পরবর্তীতে দু:স্থ উন্নয়ন কর্মসূচিতে (Vulnerable Group Development-VGD) পরিণত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় সরকার বিভিন্ন এনজিওর সহায়তায় আয়-বর্ধক কার্যক্রমে দু:স্থ মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

সরকার ক্রমান্বয়ে রেশন মূল্য ও খোলা বাজারের মূল্যের মধ্যেকার ব্যবধান দূর করে, যার ফলে রেশন পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য ক্রয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিবর্তে 'খোলা বাজারে বিক্রয়' (Open Market Sale-OMS) পদ্ধতি চালু করে। সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ ভোক্তাদের জন্য সরকার ১৯৮৯ সালে সংশোধিত রেশন (modified ration) ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রামীণ রেশন ব্যবস্থা (rural rationing system) চালু করে। উদ্দীষ্ট সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়

কাবিখা (FFW) কর্মসূচি মন্দার সময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দরিদ্রদের ক্ষেত্রে স্ব-উদ্দীষ্ট (self-targeted) হলেও নির্মাণ কার্যের নিম্নমান এবং আনুষঙ্গিক মূলধনের অভাবে এর উন্নয়ন প্রভাব ছিল সীমিত। পয়:নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতার ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট ও বাঁধের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের নেতিবাচক প্রভাব ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় দৃশ্যমান হয়। ফলে ১৯৯০ সালে সরকার কাবিখা কর্মসূচির উন্নয়ন লক্ষ্যের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করে এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ও মজবুত সংযোগ সড়ক নির্মাণে (feeder roads) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা চালু রাখে। এছাড়া সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার রোধকল্পে খাদ্য সহায়তার আওতায় নির্বাচিত উপজেলাসমূহে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে স্কুল লাঞ্চ কর্মসূচি চালু করে যা শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস ও অপুষ্টিরোধ-এ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচি প্রবর্তনে সহায়তা করে।

নব্বইয়ের দশকে খাদ্যশস্যের সরকারি বাজারজাতকরণে বেশ কিছু সংস্কার করা হয়। সারণি ২-এ খাদ্যনীতির সংস্কার কালানুক্রম দেখানো হয়েছে। স্বল্প পরিসরে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা বজায় রাখা হলেও রেশন পদ্ধতি বিলুপ্ত করা হয়। কাবিখা ও ভিজিডি কর্মসূচি পরিচালনার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও 'খোলা বাজারে বিক্রয়' (OMS) ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সরকারের প্রধান কাজ হয়ে দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মূল্যের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে খাদ্যশস্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারের একচ্ছত্র প্রভাবের বিলোপ সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। চালের মূল্য বিষয়ক রহমানের (১৯৯৪) এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমদানি সমতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ হারের সহগ (nominal rate of protection) ১৯৮০-৮৪ সালের ০.৭০ থেকে (যা দেশীয় বাজারে চালের মূল্য বিশ্ববাজারে চালের মূল্যের ৭০ শতাংশ নির্দেশ করে) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৯-৯২ সালে ০.৯৭ হয় (যা কার্যত দেশীয় ও বিশ্ব বাজারে চালের মূল্যের সমতা নির্দেশ

করে)। সুতরাং খাদ্যশস্য খাতে সংস্কারের ফলে ধান ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রণোদনা ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[৪]

উপরোক্ত পরিবর্তনসমূহের কারণে সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থার আকার এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমের বোরো ধান প্রধান শস্য হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় খাদ্যশস্যের দামের মৌসুমভিত্তিক ওঠানামা (seasonal price fluctuation) হ্রাস পায়। ফলে খাদ্যশস্যের বাজারে সরকারের সম্পৃক্ততা কমে যায়।

সারণি ২

খাদ্য নীতি সংস্কারের পদক্ষেপসমূহের ক্রমধারা

সাল	গৃহীত নীতি
খাদ্যনীতির দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনসমূহ (Long waves in food policy reforms)	
১৯৭২-৭৪	শহরাঞ্চলে রেশন চ্যানেলসমূহের ব্যাপক প্রসার ঘটে।
১৯৭৪	"কাজের বিনিময়ে খাদ্য" কর্মসূচি প্রবর্তন।
১৯৭৫	"ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং" (VGF) কর্মসূচি প্রবর্তন।
১৯৭৮	রেশন চ্যানেলের প্রদত্ত ভর্তুকি অপসারণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ
১৯৮১	public law 480 এর মাধ্যমে রেশন মূল্যকে সংগ্রহ মূল্যের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে রেশন চ্যানেলের ভর্তুকি হ্রাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়।
১৯৮৩	পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (Rural Maintenance Program) সূচনা।
১৯৮৮	গ্রামাঞ্চলে আটা চাকীর বিতরণ।
১৯৮৯	সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থার পরিবর্তে পল্লী রেশনিং প্রথার প্রবর্তন।
১৯৮৯	দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য পরিবহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।
১৯৯১	ডিসেম্বর মাসে পল্লী রেশনিং কর্মসূচি স্থগিতকরণ।
খাদ্যনীতির স্বল্পমেয়াদি পরিবর্তনসমূহ (short bursts in food policy reforms)	
১৯৯২	মে মাসে পল্লী রেশনিং কর্মসূচি বিলুপ্ত করা হয়।
১৯৯২	জুলাই মাসে প্রথম ব্যক্তিখাতে গম আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়।
১৯৯২	অক্টোবর মাসে খাদ্যশস্যে ঋণ প্রদানের স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়।
১৯৯২	নভেম্বর মাসে সরকারিভাবে ধান-চালের সংগ্রহ স্থগিত করা হয়।
১৯৯২	মিলগেট চুক্তি বাতিল করা হয়।
১৯৯২	খাদ্য অধিদপ্তরের জনবল কমানোর প্রস্তাব দেয়া হয়।
১৯৯২	সংবিধিবদ্ধ রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে চালের বিতরণ বন্ধ করে দেয়া হয়।
১৯৯৩	জুলাই মাসে প্রথম ব্যক্তিখাতে চাল আমদানি করার অনুমতি প্রদান করা হয়।
১৯৯৩	সংবিধিবদ্ধ রেশনিং চ্যানেলের মাধ্যমে গমের বিতরণ বন্ধ করে দেয়া হয়।
১৯৯৩	শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি শুরু হয়।
২০০২	শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়া হয়।
২০০২	সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রবর্তন।

উৎস: Chowdhury and Haggblade (2000), Ali *et al*. (2008).

[৪]সাহাবউদ্দিন ও জহিরের (১৯৯৫) অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, চালের ন্যূনতম সংরক্ষণ (nominal protection rate) ও কার্যকর সংরক্ষণ হারের (effective protection rate) মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং প্রণোদনামূলক কার্যক্রমকে পরিমাণগত দিক থেকে না হলেও পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক বলে বিবেচনা করা যায়।

৬। উপসংহার

গত চার দশক বা তার বেশি সময়ে বাংলাদেশের কৃষিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পানি নিয়ন্ত্রণ, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ, খাদ্যশস্য বাজারজাতকরণে সহায়তা, প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিস্তারে গবেষণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে যেসব কৌশল ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা মূলত শস্য (বিশেষত ধান ও গম) উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় এসব কৌশল ও নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কৃষিখাতে উদ্ভূত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিদ্যমান নীতি ও কৌশলসমূহে আরও পরিবর্তন আনতে হবে কিনা সেজন্য বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

এটা স্বীকার্য যে, উৎপাদনের উপকরণের বাণিজ্য ও বিপণন ক্ষেত্রে নীতি সংস্কারসমূহ মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র সাময়িক (once-for-all) প্রভাব বিস্তার করে। যখন এ প্রভাবসমূহ স্থায়ী ভাবে সমন্বয় লাভ করে, তখন মূল্য বহির্ভূত উপাদানসমূহ (non-price factors) যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তি কৃষির প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে (Hossain 1996)। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও কৃষকদের মাঝে সেগুলো সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষির প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে, বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, R. (1995): "Liberalization of Input Markets in Bangladesh: Process, Impact and Lessons," *Agricultural Economics*, 12:2.

Ahmed, R. (1999): "Assessment of Past Agriculture Policies," Chapter 3 in *Bangladesh in the 21st Century*, edited by Rashid Faruque, The University Press Limited, Dhaka.

Ali, A.M.M. et al. (2008): Chapter 5 on "Public Food Distribution System in Bangladesh: Successful Reform and Remaining Challenges" in Shahidur Rashid, Ashok Gulati and Ralph Cummings Jr.(eds.) *From Parastatals to Private Trade: Lessons from Asian Agriculture*, Oxford University Press, New Delhi.

Chowdhury, T.E. and S. Haggblade (2000): Chapter 9 on "Dynamies and Politics of Policy Change" in R. Ahmed et al.(eds.) *Out of the Shadow of Famine: Evolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh*,Johns Hopkins University Press, Bultimore, U.S.A.

Guiselquist, D. (1992): "Empowering Farmers in Bangladesh: Trade Reform Open Door to New Technology," paper presented to the Annual Conference of the Association for Economic Development Studies in Bangladesh, 21-22 November, The World Bank, Washington D.C.

Hossain, M. (1996): "Agricultural Policies in Bangladesh: Evolution and Impact on Crop Production" in Abu Abdullah and Azizur Rahman Khan (eds.) *State, Market and Development, Essays in Honour of Rehman Sobhan*, The University Press Limited.

Mujeri, M.K. et al. (2014): *Improving the Effectiveness and Efficiency of Fertilizer Use in Bangladesh: The Quality of Fertilizer and Fertilizer Distribution System*, Report prepared under Policy Research and Strategy Support Program (PRSSP) implemented by BIDS in collaboration with IFPRI and sponsored by USAID.

Osmani, S.R. and A. Quasem (1990): *Pricing and Subsidy Policies for Bangladesh Agriculture*, Research Monograph No. 11, Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka.

Rehman, S. H. (1994): "The Impact of Trade and Exchange Rate Policies on Economies Incentives in Bangladesh," Bangladesh Working Paper No. 8, Washington D.C., International Fertilizer Development Center.

Shahabuddin, Q. and S. Zohir (1995): "Projections and Policy Implications of Rice Supply and Demand in Bangladesh," Dhaka: BIDS Report for IRRI-IFPRI Project on Rice.